জন সদস্যের মধ্যে মহিলা সদস্যার সংখ্যা ৮ জন। তবে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস দল দলের মধ্যে মহিলাদের জন্য তেত্রিশ শতাংশ সংরক্ষণের নিয়ম প্রবর্তন করেছে। কিন্তু কংগ্রেস দলের কুড়িজন সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটিতে মহিলার সংখ্যা মাত্র তিন। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল এই যে, ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের লোকসভা নির্বাচনে কোন রাজনীতিক দলই দশ শতাংশের অধিক আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনীত করেনি।

বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই আলোচ্য মহিলা-বিলটির সংশোধনের পক্ষপাতী। তাঁরা মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেন। আবার মুসলমানদের জন্যও ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলনের দাবি জানান হয়। এইভাবে লিঙ্গ, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণমূলক পৃথকীকরণের ব্যবস্থা ধর্মনিরেপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের আকৃতি-প্রকৃতিকে বিপন্ন করে তুলবে।

মহিলাবিলের সমালোচনা করতে গিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক দল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনকে আবার জাতিগত বিচারে বিভক্ত করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ মহিলাদের কোটার মধ্যে আবার জাতিগত কোটার কথা বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক দলসমূহের অবস্থান অসচ্ছ। কারণ এই রাজনীতিক দলগুলি মূলত নির্বাচনী সাফল্যের বিচার-বিবেচনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক নেতাদের মনের মধ্যে আর একটি রাজনীতিক বাসনা কাজ করছে বলে মনে করা হয়। এই রাজনীতিক বাসনাটি হল নিজের পরিবারের মহিলাদের সংসদের সদস্যপদ পাইয়ে দেওয়া। নিজের পত্নী, কন্যা, বোন প্রভৃতি মহিলা পরিজনদের সংসদীয় রাজনীতিক ক্ষমতার অংশীদার করে তোলা। এবং নিজের পরিবারের মধ্যে রাজনীতিক ক্ষমতাকে যথাসম্ভব কেন্দ্রীভূত করা ও নিজের রাজনীতিক অবস্থানকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। বর্তমানে এবং নিকট অতীতে এ রকম নজিরের অভাব নেই। ভারতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থায় নেহরু-গান্ধী পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ অনেক দিনের। অভিযোগকারী রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেই এখন সংসদীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র কায়েম করতে অতিমাত্রায় আন্তরিক। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সবাই নিজের পত্নী বা পরিবারের অন্য কোন মহিলা সদস্যাকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনেক সাংসদকেই সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

জাতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে মহিলাদের যদি আবার শ্রেণীবিভক্ত করা হয়, তা হলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এ রকম গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা ভারতীয় নারীজাতির প্রতিনিধি হতে পারবেন না; তাঁরা বড়জোর সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। নারীজাতির সাধারণ স্বার্থ ও সমস্যাদি নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের বা অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মহিলা প্রতিনিধিদের বড় একটা করার কিছু থাকবে না।

ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির আগামি দিনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা মহিলা-বিলের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আইনসভায় আসন লাভের বিষয়টিকে মহিলা ও পুরুষ রাজনীতিকরা কিভাবে দেখবেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিস্মৃত হওয়া উচিত হবে না যে, নারীমুক্তিই হল মূল বিষয়। অথচ এই মূল বিষয়টি অবহেলিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজনীতিক ক্ষমতার অঙ্গনে মহিলাদের প্রবেশের বিষয়টি মুখ্য বিষয়ের গুরুত্ব পাচ্ছে। আইনসভায় মহিলাদের জন্য তেত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বড় কথা নয়; বড় কথা হল ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া সুস্থ ও সুগম করা। তবে লিঙ্গ, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে নারীজাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করলে নারীকে ক্ষমতান্বিত করার বা নারীমুক্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

১৯.১৫. ভারতীয় সমাজে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের পরিবর্তন (Change in Status of Women in Indian Society)

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নারীজাতির বিবিধ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার, সম্পত্তির, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলিই সব নয়। মহিলাদের স্বতন্ত্র স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকারও বহু ও বিভিন্ন বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে এবং করে চলেছে। সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত অনেক সরকারী আইন ইতিমধ্যে প্রণীত হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিবাহ, দত্তকগ্রহণ ও গর্ভপাতের বিষয়ে আইন প্রণীত হয়েছে। বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হল : বিবাহের বয়স, জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন, পণপ্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, খরপোষ, পুনর্বিবাহ, দাম্পত্য অধিকার

সাংবিধানিক ও অন্যান্য অধিকার

প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। কলকারখানায় কাজের পরিবেশ, অভিন্ন কাজের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমমজুরী, কাজের বা চাকরির নিরাপত্তা, মাতৃমঙ্গল, সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আর্থনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক আইন প্রণীত হয়েছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার স্বীকার করে আইন প্রণীত হয়েছে।

ভারতে নারীমুক্তি বা নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষণমূলক বিবিধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এই সমস্ত নারী-আন্দোলনের আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকারও বিভিন্ন সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তারফলে সাংগঠনিক ও জীবনধারাগত ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের সুবাদে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতিক অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আবার ইতিমধ্যে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা সংগঠনসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত সংগঠন মহিলাদের স্বার্থ ও সমস্যাদি সম্পর্কে সদর্থক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। উল্লিখিত ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তনসমূহের সুবাদে নারীজাতির উপর শোষণ-পীড়ন ও অবদমনমূলক সমস্যাদির অনেকাংশে সুরাহা হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এমন দাবিও কার যাবে না যে, নারী নির্যাতনমূলক যাবতীয় সমস্যার সম্যক সমাধান হয়ে গেছে। মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা বলা হয়, সেগুলি অনেকাংশে আন্তরিক এবং লোকদেখান প্রকৃতির। সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনসমূহের সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাস্তবে এখনও মহিলাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হতে হয়। মহিলারা এখনও অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। পুরুষের প্রাধান্য ও কর্তৃত্বকে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠা এখনও মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সাংগঠনিক ও জীবনধারাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন

ন্যায্য প্রাপ্য থেকে মহিলাদের বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই **বঞ্চনা** বিভিন্ন বিষয়ক হতে পারে। বঞ্চনা অর্থ বা সম্পত্তি বিষয়ক হতে পারে ; সাধ-আহ্লাদ সম্পর্কিত হতে পারে; ক্ষমতা সম্পর্কিত হতে পারে; পীড়নমূলক পরিবারিক অবস্থা সম্ভূত হতে পারে; বর্জনের বিকার সঞ্জাত হতে পারে; হটকারী আচরণের কুফলমূলক হতে পারে প্রভৃতি। আবার সমাজজীবনে বঞ্চিতা মহিলাদের চিহ্নিত করে পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ রকম মহিলারা সাধারণত হীনমন্যতা থেকে ভোগেন; এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয়; এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক ধরনের অসহায়বোধ থেকে ভোগেন; আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল; এঁদের মধ্যে সামাজিক পরিপক্কতার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবও অনস্বীকার্য। ন্যায্য অধিকার থেকে মহিলাদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে পুরুষদের দায়িত্বই সর্বাধিক। এ রকম পুরুষদের চিহ্নিত করে পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ রকম পুরুষেরা সাধারণত হীনম্মন্যতা ও হতাশা থেকে ভোগেন; এঁদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়; এঁদের অনেকের মধ্যে সন্দেহবাতিক মানসিকতাও দেখা যায়। নারী অবদমনকারী পুরুষদের মধ্যে আত্মগরিমা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ রকম পুরুষদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিবিধ সীমাবদ্ধ ও ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনও দেখা যায় যে, এ ধরনের পুরুষদের অনেকেই শৈশবে ও কৈশোরে অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। আবার এ রকম অনেক পুরুষই ব্যক্তিগতভাবে প্রবল পারিবারিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে ভুগে থাকেন।

মহিলাদের বঞ্চনা ঃ বঞ্চিতা ও বঞ্চনাকারী

অভিপ্রেত অধিকার থেকে মহিলাদের বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটে বিভিন্ন কারণে। আলোচনার সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট কারণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই কারণগুলি হল ঃ অর্থনীতি সম্পর্কিত, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত এবং জনবিন্যাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত। প্রাপ্য অধিকার থেকে মহিলাদের বঞ্চিত হওয়ার পিছনে আর্থনীতিক কারণসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত পরিবারের রুজিরোজগার কম বা মোটামুটি মাঝারি মানের, অর্থাৎ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণত অধিকতর সংখ্যায় মহিলাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। উচ্চবিত্ত পরিবারসমূহে এরকম ঘটনা সাধারণত খুব বেশী ঘটে না। উপার্জনশীল মহিলারা নিজেদের ন্যায্য অধিকারসমূহ থেকে বড় একটা বঞ্চিত হন না। আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতাই রোজগেরে মহিলাদের যাবতীয় অধিকার ভোগের বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে সুগম করে। বিপরীতক্রমে যে সমস্ত মহিলা আর্থিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভরশীল; নিজের কোন উপার্জনের ব্যবস্থা নেই, তারাই সাধারণত অধিকতর সংখ্যায় অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হন। আবার উপার্জনশীল মহিলাদের মধ্যেও এ ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তারী, অধ্যাপনা বা অনুরূপ উচ্চ মর্যাদার কাজে বা চাকরিতে নিযুক্ত মহিলারা বিবিধ সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অবস্থায় অবস্থিত। স্বভাবতই এই শ্রেণীর মহিলাদের অধিকার ভোগের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক কোন রকম নিয়ম-নিষেধ থাকে না বললেই চলে। অপরদিকে যে সমস্ত মহিলা কোন বিশেষ-বৃত্তিমূলক কাজ করেন না, অতি সাধারণ কাজকর্মে নিযুক্ত থাকেন এবং যে সমস্ত কাজ কর্মের তেমন কোন মর্যাদাগত গুরুত্ব নেই, সেই সমস্ত **মহিলাদের অল্পবিস্তর বঞ্চনার** শিকার হতে হয়।

বঞ্চনার আর্থনীতিক কারণ

ব্যক্তিগত কারণেও ন্যায্য অধিকার ভোগ থেকে মহিলাদের বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ভাল সংখ্যায় ঘটে। পুরুষ মানুষের গুণগত যোগ্যতা, স্বভাব-চরিত্র ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগত তারতম্যের জন্য কোন কোন পুরুষের মধ্যে নারীকে স্বাভাবিক অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর পুরুষদের চিহ্নিত করে পর্যালোচনা করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। বৌদ্ধিক মান যাদের কম এ রকম পুরুষদের মধ্যে নারী নির্যাতনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আবার হতোদ্যম, নিরাশ ও অপরিণত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষদের অধিক সংখ্যায় নারীকে অবদমিত করতে দেখা যায়। তেমনি আবার নারী নিপীড়নকারী পুরুষদের মধ্যে সাধারণভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশী দেখা যায়। সমাজে এমন কিছু পুরুষ দেখা যায় যাদের মহিলাদের কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা আশাতিরিক্ত। এ ধরনের পুরুষেরা সাধারণত আশা করেন যে, মহিলারা সদাই সেবা পরায়ণ হবে এবং পুরুষের প্রতি অনুগত থাকবে। এই শ্রেণীর পুরুষেরাও সাধারণত নারীকে অবদমিত রাখতে উদ্যোগী হয়।

ব্যক্তিত্বগত কারণ

নারী অবদমনের ক্ষেত্রে জনবিন্যাসের প্রকৃতিগত বিষয়টিকেও অবহেলা করা যায় না। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য জানা যায়। প্রাপ্য অধিকার থেকে মহিলাদের পুরুষ যেমন বঞ্চিত করে, তেমনি মহিলাদের মহিলারাই বঞ্চিত করে। এবং অবাক হওয়ার বিষয় হল এই যে, মহিলা কর্তৃক মহিলাদের বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাই হল অধিক। আবার বয়স্ক ব্যক্তিরাই মহিলাদের বেশী বঞ্চিত করে; অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মানুষ মহিলাদের খুব বেশী বঞ্চিত করে না। নীচু জাতের বা জাতিগত বিচারে মধ্যবর্তী অবস্থায় মহিলারা ন্যায্য অধিকার থেকে অধিক সংখ্যায় বঞ্চিত হয়। উচ্চবর্ণের ও উচ্চ জাতির মহিলাদের ক্ষেত্রে বঞ্চনা বা নির্যাতনের ঘটনা খুব বেশী ঘটে না।

স্তরবিন্যাসগত কারণ

ভারতের সমাজব্যবস্থায় এখনও মহিলাদের মর্যাদাহানি, অবদমন ও অপমানজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। নারী-পুরুষভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নারীজাতির উপর পুরুষের কর্তৃত্বমূলক আচরণ আধুনিক ভারতে আকচার দেখা যায়। নারী নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার ঘটনা সংবাদ মাধ্যমসমূহে প্রায়শই প্রকাশিত হয়। বাস্তবে এ রকম অপরাধ সংঘটিত হয় অনেক বেশী। অধিকাংশ ঘটনাই অপ্রকাশিত থেকে যায়।

এসব অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এটাই সব নয়। আধুনিক ভারতের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান আগের মত অতটা আপত্তিকর বা হতাশজনক নয়। পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের প্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ বড় একটা নেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির অবস্থা এতটা ভাল ছিল না। সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের অবস্থার অধিকতর উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক এবং আইনগত অধিকারের পরিধি প্রসারিত হয়েছে। মহিলারা এখন অনেক বেশী অধিকার ভোগ করেন। তাঁদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে নারীকণ্ঠ এখন সোচ্চার। জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়ে মহিলাদের এখন খোলামেলাভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

প্রগতিমূলক পরিবর্তন

আধুনিক ভারতের সাম্প্রতিক সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের সঠিক অবস্থান অনুধাবনের জন্য বিষয়টিকে দুটি পর্যায়ে পর্যালোচনা করা দরকার। শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের বিষয়টি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত ও কর্মহীন মহিলাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে তেমন একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে পার্থক্য যে একেবারেই নেই তা নয়; পার্থক্য আছে, কিন্তু কম। শহরাঞ্চলের অধিবাসী মহিলাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সম্পদশালী শ্রেণীর মহিলাদের এবং দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই জীবনধারাগত স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এই দুই শ্রেণীর মহিলাদের নিজস্ব ধরনের জীবনধারা আছে। অপরদিকে মধ্যবর্তী শ্রেণীর মহিলাদের জীবনধারাগত অবস্থান উপরিউক্ত দুটি ধারার সংযোগস্থলে। মধ্যবর্তী শ্রেণীর মহিলাদের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। শহরাঞ্চলের এই তিন শ্রেণীর মহিলাদের জীবনধারা স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল। এ ক্ষেত্রে জীবনধারাগত স্বাতন্ত্র্যের সীমারেখা আছে এবং এই সীমারেখা অলঙ্ঘনীয়। অর্থাৎ ভারতের মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান বিচার-বিবেচনা করার গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ হল : বিত্তবান, বিত্তহীন ও মধ্যবর্তী শ্রেণী।

মহিলাদের বাসস্থান ও শ্রেণীগত পার্থক্য

সাম্প্রতিককালের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। এই উন্নতির পরিচয় সূচক কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নারীজাতির মধ্যে সর্বস্তরের শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ডাক্তারী ও ইন্‌জীনীয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিমূলক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে ছাত্রীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের উন্নতি ঘটেছে। সাধারণ ও উচ্চবেতনের অনেক কাজে মহিলাদের এখন নিযুক্ত দেখা যায়। উপার্জনশীলতার কারণে মহিলাদের স্বনির্ভরতার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী অনেক উচ্চপদে এবং উচ্চ-বেতনের চাকরিতে মহিলাদের বর্তমানে ভাল সংখ্যায় নিযুক্ত দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন আইনসভায় এবং অন্যান্য রাজনীতিক পদসমূহে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনমূলক এবং পরিচালনামূলক কাজকর্মেও মহিলারা এখন আর পিছিয়ে নেই। এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুরুষ আবেদনকারীর থেকে মহিলা আবেদনকারীর সংখ্যা অধিক। নারী নির্যাতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

মর্যাদাগত অবস্থানের উন্নতির সূচক

আধুনিক ভারতের সমাজব্যবস্থায় সাবেকি মূল্যবোধসমূহ অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে সাম্য, স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি আধুনিক মূল্যবোধসমূহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালের সমাজজীবনে মহিলারা নিজেদের একটি অবস্থান অর্জন করেছে। আধুনিককালের ভারতীয় সমাজে মহিলাদের অবস্থানগত স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা সুবিদিত। পরিবার ব্যবস্থায় নারীজাতির সাবেকি অবস্থান ছিল অবদমিত। পরিবার পরিচালনার উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষেরা ইতিমধ্যে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, পরিবার ব্যবস্থার উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য অধুনা অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা বর্তমানে সমানাধিকার সম্পন্ন। কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা এখন অনেক বেশী। কর্মক্ষেত্রের মত পরিবারের মধ্যেও মহিলাদের সুযোগ-সুবিধার পরিধি প্রসারিত হয়েছে।

মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

সনাতন বিবাহ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্য ও মর্যাদা অধুনা অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রাক্-বৈবাহিক সংযোগ-সম্পর্ককে সমাজে সহ্য করা হয়। জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী পছন্দ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীরা বহুলাংশে স্বাধীনতা ভোগ করে। পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাবেকি সামাজিক নিয়ম-নিষেধ সাম্প্রতিককালে শিথিল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সুশিক্ষিতা, চাকুরিরতা বা উপার্জনশীল রমণীকে বধূ হিসাবে বরণ করার ব্যাপারে পাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের মধ্যেও এ বিষয়ে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে মেয়েরা এখন পুরুষদের সঙ্গে এক রকম সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। কোন চাকরির ক্ষেত্রেই এখন পুরুষের পূর্বেকার একাধিপত্য আর নেই। বরং কোন চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিককালের সমাজব্যবস্থায় কর্মরত বা উপার্জনশীল দম্পতিদের স্বতন্ত্র মান-মর্যাদাযুক্ত দেখা যায়। এখন তাই পাত্র-পাত্রীদের বেশী বয়সে বিবাহ করতে দেখা যায়। কারণ বিবাহের জন্য এখনকার যোগ্যতা অর্জন করতে বয়স হয়ে যায়।

পাত্রী হিসাবে উপার্জনশীল মেয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি

আগেকার যৌথ পরিবারসমূহ ভেঙ্গে পড়েছে। শিশু সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে এর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে। দম্পতি কেন্দ্রিক ছোট পরিবারে সন্তানেরা নিতান্তই নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে উঠার জন্য এদের মধ্যে স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। কর্মরত দম্পতিরা কাজে বেরোনোর পথে শিশুসন্তানকে 'ক্রেইশে' (Creche) রেখে যান। কাজের দিনে শিশুসন্তানের তত্ত্বাবধান হয় ক্রেইশে। কাজ থেকে ঘরে ফেরার পথে দম্পতিরা শিশুসন্তানকে ক্রেইশ থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সাবেকি ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এই শ্রেণীর মহিলারা এখন গার্হস্থ্য জীবনের কাজকর্মে বা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্পাদনে সর্বক্ষণ নিযুক্ত বা ব্যস্ত থাকেন না। এঁরা সম্পত্তিবান শ্রেণীর পর্যায়ে নিজেদের উপনীত করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

গৃহকর্মে সদাব্যস্ত নয়

উৎপাদনমূলক কাজকর্মে মহিলাদের উদ্যোগ-আয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়িক উদ্যোগেও মহিলাদের অংশগ্রহণের হারও ভাল। প্রশাসনিক আধিকারিক ও উচ্চপদস্থ আমলাদের মধ্যেও মহিলাদের সংখ্যা খারাপ নয়। যন্ত্রশিল্পী ও বাস্তুশিল্পী এবং চিকিৎসকের পেশায়ও মহিলাদের এখন ভাল সংখ্যায় দেখা যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানে মহিলাদের অবাধ বিচরণ। পুরুষের একাধিপত্যের ক্ষেত্র এখন আর নেই।

রাজনীতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে। সংসদে, বিধানসভায়, পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চায়েত পর্যায়ে আইন করে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজনীতিক প্রশাসনের উচ্চপদেও মহিলাদের আসীন দেখা যায়।

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী মহিলারা এখনও অনেকাংশ ঐতিহ্যবাদী। সাবেকি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর তাঁরা গভীরভাবে আস্থাশীল। এবং জীবনধারাগত ক্ষেত্রসমূহে তাঁরা সাধারণত রক্ষণশীল। কিন্তু শহরাঞ্চলের মহিলারা রক্ষণশীলতা ও সাবেকিয়ানার বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী ভূমিকায় সক্রিয়।

তবে শহরাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মহিলারাই সমভাবে প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ এমন কথা বলা যায় না। নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের জীবনধারাগত পরিস্থিতির তেমন একটা পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও তাঁরা অনেকাংশে ঐতিহ্যবাদী জীবন যাপন করে থাকেন। এখনও সমাজব্যবস্থায় তাঁদের অবস্থান অবদমিত। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁরা এখনও পুরুষের নিয়ন্ত্রণমূলক নিগড় থেকে মুক্ত নন। সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক অবস্থানগত বিচারে এই মহিলারা পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত নন। শহরাঞ্চলের এই শ্রেণীর মহিলারা কম উপার্জনশীল বা একেবারে উপার্জন হীন। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতার কারণে এখনও এঁরা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হন।

সুতরাং পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার নিয়ম-নিষেধের নিয়ন্ত্রণমূলক নিগড় থেকে নারীজাতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও মুক্ত নয়। মহিলাদের একটা বড় অংশকে এখনও অনেকাংশে ঐতিহ্যবাদী জীবনধারা অনুসরণ করতে হয়। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে মহিলারা নিজেদের পরিবার বা সমাজের কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্য-সহযোগিতা পান না।

মূল্যায়ন (Evaluation)

সামগ্রিক বিচারে সাম্প্রতিককালের সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির সম্যক অবস্থান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত এবং একক ও অভিন্ন কোন প্রতিবেদন তুলে ধরা সহজ কাজ নয়। গ্রামাঞ্চল-শহরাঞ্চলগত তারতম্য, শ্রেণীগত স্তরবিন্যাস, শিক্ষাগত পার্থক্য, আর্থনীতিক অবস্থাগত পার্থক্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্যের কারণে এ বিষয়ে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সামগ্রিক বিচারে ভারতের নারীজাতি অভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। আধুনিককালের মহিলারা আগেকার দিনের মহিলাদেরই অংশবিশেষ। অর্থাৎ আধুনিককালের ভারতীয় মহিলাদের মধ্যেও সনাতন ভারতীয় মহিলাদের চারিত্রিক গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের বেশ কিছু উপাদান বর্তমান। আজকের মহিলাদের মধ্যে আত্মভালবাসা যেমন আছে, তেমনি পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী প্রভৃতি চারপাশের অন্য সকলের প্রতি ভালবাসাও আছে। প্রয়োজনে আজকের ভারতীয় নারী দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এমন কি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তেমনি আবার সেই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে নারীসুলভ মায়া-মমতা, আবেগ-অনুভূতি, বিবেক-বিবেচনা, সেবা-পরায়ণতা প্রভৃতি সুকোমল মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিককালের ভারতীয় মহিলা জায়া-জননীর ভূমিকায় আন্তরিক; অনুরূপভাবে আবার কর্মজীবনে উন্নতির উদ্যোগে যত্নবান। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে অর্থবহ ভারসাম্য বা সম্যক সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে সাম্প্রতিককালের ভারতীয় মহিলাদের সাফল্য অনস্বীকার্য।

স্বাধীন ভারতে নারী সমাজে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দিকেও মহিলারা ছিলেন মূলত রক্ষণশীল এবং পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্যের অন্ধ অনুগামী। সেই পরিস্থিতি একবিংশ শতাব্দীর দোরগড়ায় একেবারে বদলে গেছে। ভারতীয় মহিলারা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার দাবি করেন, আদায় করেন ও ভোগ করেন। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষদের সমকক্ষ যেন তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহিলারা সক্রিয় ও সচেষ্ট। সনাতন মূল্যবোধ ও সাবেককালের গোঁড়ামির খোলস ছেড়ে আধুনিককালের ভারতীয় মহিলারা বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা নিজেদের গুণগত যোগ্যতা বা সামর্থ্য সম্বলের উপর অধিকতর আস্থাশীল। সাম্প্রতিককালের সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা নিজের স্বতন্ত্র ও উপযুক্ত অবস্থান নির্ধারণ করে নিয়েছেন। আগেকার দিনে সাধারণত মহিলাদের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কোন পরিচয় ছিল না। তাঁরা পরিবারের পুরুষ সাংসদের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচয় পেতেন। পিতার কন্যা, বা পতির পত্নী বা পুত্রের মাতা হিসাবে মহিলারা পরিচিত হতেন। বর্তমানে এই পরিস্থিতির বহুলাংশে পরিবর্তন ঘটেছে। মহিলারা এখন নিজেদের নামেই পরিচিতি লাভ করছেন। মহিলারা এখন ব্যক্তিগতভাবে অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রতিককালের সমাজব্যবস্থায় মহিলারা আর নিজেদের পুরুষের পাপোশ হিসাবে প্রতিপন্ন করেন না। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁরা চিন্তাভাবনা করেন এবং সন্তানসন্ততির উপর নিজেদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে আরোপিত করেন। অন্যায়-অবিচার হলে তাঁরা আর মুখ বুজে সহ্য করেন না, প্রতিবাদ করেন। জায়া-জননীর ভূমিকার বাইরেও মহিলাদের কর্মক্ষেত্র ও পরিচিতি বর্তমানে প্রসারিত। মহিলারা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত করেছেন। পরিশেষে অধ্যাপক আহুজার (Ram Ahuja)-র এক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। *Society in Indian* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি বলেছেন ঃ ''There has been metamorphosis in a woman. From the conservative woman of the 1940s and 1950s, she became the feminist reactionary of the 1960s, and the 1970s, the super woman mother-wife-career woman of the 1980s, and the empowered woman of the 1990s, who demands and enjoy her rights and is not afraid to stand alone.''